রিজওয়ানুরের মৃত্যু ——— পুলিশী অত্যাচারের পরম্পরা ও একজন নাগরিকের মতামত

রিজওয়ানুরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বিষয় সামনে এসেছে। সরকারের ভূমিকা , পুলিশের কাজকর্ম , সামাজিক উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ।

১. সরকারে কোন ব্যক্তি , মন্ত্রী রয়েছেন , তিনি কতটা সংস্কৃতিমনা , সৎ সেটা বোধহয় খুব কিছু গুরুত্ব বহন করে না । কংগ্রেসী শাসনে বেলেঘাটার সিপিএম কর্মী অসীমা পোদ্দারের ওপর পুলিশ লকআপে অত্যাচারের কথা প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হওয়ার বিজয় উৎসবে ব্রিগেডের জনসভায় নির্যাতিত নারী হিসাবে তুলে ধরেছিল , বামফ্রন্ট সরকারে আসীন হওয়ার পেছনে এইসব মানুষের আত্মবলিদানের ভূমিকাকেও স্বীকার করেছিল , তবু সেদিনের সেই ঘটনায় কোন দোষী অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের শাস্তি হয়নি।

২. অর্চনা গুহ , লতিকা গুহর ওপর চূড়ান্ত শারিরীক নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়েছিলেন যে রুনু গুহনিয়োগী তাঁকে অমৃত্যু কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি। প্রাথমিক ভাবে অভিযুক্ত হওয়ার পর ন্যূনতম সাসপেন্ড টুকুও করা হয়নি। উল্টে তাঁকে ডাকাত ধরায় পারদর্শী বলে প্রমোশন দিয়েছে জ্যোতি বসুর সরকার।

৩. সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত ঘটনার পরেপরেই বলেছেন এখানে তো বিচারবিভাগীয় তদন্ত তবু হয় অন্য রাজ্যে তো সেটুকুও হয়না । হয়তো ঠিক । কিন্তু এ রাজ্যে তার রিপোর্ট প্রকাশ হয়না আর হলেও সুপারিশ মতো দোষী পুলিশরা শাস্তি পায়না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনে ২৬টা বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন হয়েছে । ২০০০ পর্যন্ত ২০টা বিচারবিভাগীয় কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে । সরকার একটি ক্ষেত্রেও সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়নি । লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে ইদ্রিশ মিএগকে হত্যার ঘটনায় বিচারপতি সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব কমিশন গঠিত হয়। প্রায় পাঁচ বছরের মাথায় সাতজন পুলিশ কর্মীকে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী কার্যবিধি করা হয়নি । এক্ষেত্রে তদানীন্তন লকআপ ওসি দীপক রায়কে সাসপেন্ড করা হয়েছিল । ১৯৮১তে দার্জিলিং পুলিশের গুলিতে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় বিচারপতি অম্বিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য কমিশন গঠিত হয়। চার বছরের মাথায় কমিটি রিপোর্ট পেশ করলেও , সরকার সেই অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ২২ বছর পেরিয়ে গেলেও কোন রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। মুর্শিদাবাদের কাটরা নিয়ে হরিপদ দাস কমিশনের উনিশ বছর পেরিয়ে গেলেও রিপোর্ট পেশ হয়নি। বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন এবং রিপোর্ট প্রকাশ , পুলিশকে দোষী সাব্যস্ত করে রিপোর্ট দিলে সেই অনুযায়ী সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা - দীর্ঘসূত্রীতা বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে এক প্রহশনে পরিণত করেছে।

৪. কমল ঠাকুর , ভিখারী পাসোয়ান , বাবাই বিশ্বাস , রাজ চক্রবর্তী , মহম্মদ আলম , খগেন মাঝি , সঞ্জীব পাল , হরিশ বিশ্বাস , সুরেশ বারুই , পার্থ মজুমদারকে ভুয়ো সংঘর্ষ , অপহরণ , গুমখুন ও হত্যার জন্য পুলিশকেই দায়ী করা হয়।

(ক) ১৯৮৭, ঝাড়গ্রামের শুভঙ্কর ষড়ঙ্গী হত্যায় ৪ জন পুলিশকে আদালত ৫ বছর কারাদন্ড দেয় । চাকরি থেকে খারিজ তো দূরে থাক সরকার ওদের বরখাস্ত পর্যন্ত করেনি।

(খ) ১৯৯৫, গার্ডেনরীচ থানা একটি সাধারণ অপরাধের ঘটনায় মহম্মদ আলমকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তার

মুক্তির জন্য ৪ হাজার টাকা চায়। তা দিতে না পারলে বেধড়ক পিটিয়ে আদালতে পেশ করে। আদালত তার শরীরের আঘাত না দেখেই জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেলে আলম মারা যায়। আলমের দেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ২৮।২৯ টি আঘাতের চিহ্ন ধরা পড়ে। পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ৬ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে মহম্মদ আলম খুনের অপরাধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়না। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। একাধিকবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে অথচ একই সময়ে তারা বিভিন্ন থানা , লালবাজারে কাজ করে গেছে। সরকার ব্যবস্থা নেয়নি।

(গ) ১৯৯৭, খগেন মাঝিকে কল্যাণী থানার পুলিশ , ওসি সহ বেশ কয়েকজন মিলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করে। মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ গেলে সংঘর্ষের কাহিনী নস্যাৎ করে ঘটনায় যুক্ত পুলিশ কর্মীদের দোষী সাব্যস্ত করে। ফৌজদারি মামলা করার সুপারিশ করে। খগেনের মা আসামীদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করেন। পুলিশ প্রশাসন টাকার লোভ দেখায়। রাজি না হলে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। আদালত খগেনের পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এসপি ব্যবস্থা নেননা । হুমকি চলতে থাকে । আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে, এক্ষেত্রেও অপরাধীদের খুঁজে পাওয়া যায়না। ২০০৪ সালের ২৩ জানুয়ারি খগেন মাঝির মেজ ভাই নগেন মাঝিকে পুলিশ অপহরণ করে। আজও নগেনকে পাওয়া যায়নি। বহাল তবিয়তে দোষী পুলিশরা আজও কাজ করছে।

(ঘ) ২০০১ , বিধানসভা নির্বাচনের দিন তপি দাসকে পুলিশ তাড়া করে , সে সুভাষ সরোবরে পড়ে যায়। পুলিশ জলে নেমে তপি দাসকে পেটায়। সে মারা যায়। এসি , ওসি , এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে । নিম্ন আদালত , হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে আগাম জামিন খারিজ হয়ে যায় । তবু প্রশাসন তাদের গ্রেপ্তার করেনি , ন্যুনতম সাসপেন্ড করেনি , তারা সবাই কর্মরত ।

৫. ১৯৯৭, ৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যে পুলিশ কর্তৃক ভুয়ো সংঘর্ষে সুরেশ বারুই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। সেখানে উপস্থিত বহু মানুষের সামনে দিয়ে হাবড়া থানার পুলিশ পার্থ মজুমদারকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অপহরণ করে নিয়ে যায়। ১২. ১.০৪ ও ১৯.২.০৪ সি আই ডি ১১ জন পুলিশকর্মীকে পার্থ মজুমদার অপহরণের জন্য ও গুম খুন ও সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাটের দায়ে আসামী সাব্যস্ত করে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৪।২০১।৩৪ ধারায় চার্জশীট দিয়েছে। যদিও মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশে সন্দেহাতীত হিসাবে জড়িত আরও দুজন পুলিশ কর্মীর নাম সিআইডি চার্জশীট থেকে বাদ দিয়ে রেহাই দেয়। লক্ষ্যনীয় হল আজ পর্যন্ত আসামী পুলিশ কর্মীদের গ্রেপ্তার , সাসপেন্ড বা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রেখে বিচার করার দাবিকে সরকার মান্যতা দেয়নি। উল্টে আসামীদের পদোন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। আসামীরা লালবাতি লাগানো সরকারি গাড়িতে চেপে দেহরক্ষী নিয়ে আদালতে আসছে।

৬. মুখ্যমন্ত্রী যতই পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় পুলিশকে জনগণের বন্ধু হয়ে উঠতে বলুন , সাধারণ মানুষের রোজকার অভিজ্ঞতা , পুলিশ মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়া বা ব্যাঙ্কের চেকবই খোয়া যাওয়ার মতো পাতি একটা ডায়রিও বিনা ঘুষে নিতে চায়না। ন্যুনতম এক প্যাকেট সিগারেট না নিয়ে গেলে কোন জেনারেল ডায়রি যেখানে নেওয়া হয়না , সেখানে মেয়ে অপহরণে ব্যবসায়ীর অভিযোগে পুলিশের অতি সক্রিয়তার পেছনে রয়েছে আর্থিক লেনদেনের বিষয় একথা অবশ্যই বলা যায়।

৭. পুলিশের ভয় দেখানোর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দল ও নেতারা অনেক অকাজ কুকাজ করে থাকেন। অর্থবান ও ক্ষমতাশালী মানুষদের হয়ে যে মিথ্যা কেস রুজু , শাসানো , ভয় দেখানো হয় , এর জন্যেই

বিচারপতি মোল্লা পুলিশকে রাষ্ট্রীয় মদতে সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই ধারা আজও সব ক্ষেত্রে বর্তমান।

৮. স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে যাঁরা বিয়ে করেছেন তাঁদের অধিকাংশের অভিজ্ঞতা হল , ক্ষমতাবান আত্মীয় বা পুলিশ প্রশাসনের বা রাজনীতির , সমাজের মাতব্বরদের অন্যায় - বেআইনি হস্তক্ষেপ ঘটেছে। এমনকি বামপন্থী দলের অভ্যন্তরেও এমন ঘটনায় পুলিশি ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হয়েছে।

৯. কমল ঠাকুরের বাবা দাদাকে একে একে খুন করা হয়েছে , দোষী পুলিশের শাস্তি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য। এমন ঘটনা আরও অসংখ্য আছে। সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট করবার জন্য এই ঘৃণ্য কাজ পুলিশ প্রশাসন করে চলেছে। কোন বিচার হয়নি , বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেও শাস্তি হয়নি। বিবেকবান ভদ্রমন্ডলী , সুধী নাগরিক অশান্তি চাননি তাই সরব হননি।
রিজওয়ানুর অনেক আগেই আশঙ্কা করে কড়েয়া থানায় , পুলিশ কমিশনারকে , মানবাধিকার সংস্থা সহ আরও অনেককে জানালেন , হয়তো সবাই সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ করলেন , তবু পুলিশের প্রাণনাশের হুমকি , বিনাবিচারে মিথ্যা দোষী সাজিয়ে গ্রেপ্তারের হুমকি চলতেই থাকল।
এটা খুবই দু:খের যে প্রচারমাধ্যম রিজওয়ানুরের মৃত্যু পর্যন্ত কিছু জানলেননা বা জানলেও ফোকাস বা স্টোরি লাইন ঠিক মতো খুঁজে পাওয়া গেলনা।
সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ , অনভিজ্ঞ , পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট মানুষজন সবাই সচেষ্ট তবু রিজওয়ানুরের মৃত্যু হল।
এখন অনেক মিছিল মিটিং প্রতিবাদ , পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার ! পুলিশি অত্যাচারে নির্যাতনে এই বাংলায় অসংখ্য পরিবার তাদের অনেক অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছে। খুব সামান্য যে কয়েকটি পরিবার দোষী পুলিশের শাস্তি চেয়ে এক অসম লড়াইয়ে আজও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে , আসুন আমরা তাদের পাশে থাকি।

নব দত্ত
ফোন ২৩৪৪৯৩২৮
ই-মেল nprajna2005@yahoo.com
duttaraychaudhuri@gmail.com